প্রাচীন ভারতে দুর্নীতি

শুভজিৎ দাশগুপ্ত

এ'কালে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে দুর্নীতির প্রশ্নটি এত গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে যে এর উপস্থিতি ও প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। অবচেতন মনে একে বোধহয় আমরা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে'ই ধরে নিয়েছি। তাই দুর্নীতির পরিভাষা ও দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারণ করবার নিরিখ সম্পর্কে আমরা খুব একটা কৌতূহলী নই। অথচ দুর্নীতি বিষয়ক যে কোন তাত্বিক আলোচনা করতে গেলে দুর্নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে। সে' জন্য প্রথমেই চাই দুর্নীতির সহজ পরিভাষা।

সাধারণ অর্থে যে কোন নীতি-বিগর্হিত কর্মকে'ই দুর্নীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে নীতি শব্দের অর্থ নিছক Policy নয়। নীতি হল ethics, অর্থাৎ এমন এক সদর্থক মূল্যবোধ, একমাত্র বিবেকের কাছেই যা দায়বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই বিবেকনির্ভর মূল্যবোধ সমাজকে ধারণ করছে এবং সেই কারণে'ই একে 'ধর্ম' বলা চলে। আর এখানেই অপরাধ (Crime) ও দুর্নীতির (Corruption) মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রভেদ চোখে পড়ে। অপরাধ আইনের শাসনকে লঙ্ঘন করে এবং আইনের সাহায্য নিয়েই আদালত অপরাধীকে দন্ড দেয়। কিন্তু দুর্নীতি সরাসরি আইনের বিরোধীতা করে না। ব্যাধির মত নিঃশব্দে আইনের নজর এড়িয়ে সে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। এই প্রক্রিয়া এত মন্থর গতিতে অগ্রসর হয় যে অনেকসময় বাইরে থেকে একে অনুভব করা যায় না। অপরাধ ও দুর্নীতির এই প্রভেদ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের মানুষ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে অপরাধ 'ধর্মনাশ' করে কিন্তু দুর্নীতির ফলে ধর্মের 'গ্লানি' ঘটে। আয়ুর্বেদগ্রন্থ চরক সংহিতায় 'গ্লানি' শব্দটিকে 'বিকৃতি' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। ধাতুবৈকল্য অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির বিকার থেকে দেহে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, এ'কথাও সেখানে বলা হয়েছে। অতএব এই মন্তব্যের সূত্র ধরে আমরা দুর্নীতিকে একটি সামাজিক ব্যাধি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সমাজ নেই যা'কে এই ব্যাধি স্পর্শ করেনি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বেদ-অধ্যয়ণ সম্পন্ন করে উপনিষদের ঋষি তরুণ স্নাতকদের বলেছেন, "যানি অনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতাব্যানি নো ইতরানি," (**কঠোপনিষদ**) — অর্থাৎ নিন্দনীয় নয়, এমন কর্মই শুধু করবে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম করবে না। অতএব, নিন্দনীয় কর্ম ছিল এবং

তার বিরুদ্ধে ভাবি প্রজন্মকে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। এই নিন্দনীয় কর্মের মধ্যে কিছু এমন কাজ ছিল, যা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

প্রসঙ্গতঃ, এ'কথা উল্লেখ করা দরকার যে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে একটি বিশেষ শব্দের সাহায্যে অপরাধকে দুর্নীতি থেকে পৃথক করা হয়েছে। সুত্তনিপাতগ্রন্থে (১০৬.২.৭০.,৪১) অপরাধমূলক বৃত্তিগুলিকে বলা হয়েছে "সাহস।" যারা এধরণের কাজ করে জীবন নির্বাহ করতেন, সেই অপরাধজীবী (ভাড়াটে দস্যু, পেশাদার খুনী প্রভৃতি) ব্যক্তিদের বলা হয়েছে "গূঢ়জীবী।" কূটযুদ্ধ ও গুপ্তহত্যায় এঁরা বিশেষ পারদর্শী হতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তস্কর (চোর-ডাকাত), গ্রন্থিছেদক (গাঁটকাটা), গৃহভেদক (সিঁধেলচোর/burglar), অবরোধক (ঠগী বা ঠাঙাড়ে), নৃশংসিন্ (খুনী) প্রভৃতি নানা ধরণের অসামাজিক তত্ত্বের উল্লেখ আছে। টাকা নিয়ে কাজ করবে, এ'রকম "পেশাদার গুন্ডা"র অভাব ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সৈন্যদের জাস্টিন্ "Robbers and brigands of the day" আখ্যা দিয়েছেন। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে এদের আনুগত্য ক্রয় করা হয়েছিল (**"ধাতুবাদোপার্জিতেন দ্রবিণেন চণিপ্রসূ"ঃ, ৮'ম অধ্যায়, ২৫৩-৫৪, পরিশিষ্টপর্বন্**)। অথচ দুর্নীতি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন সঠিক প্রতিশব্দ প্রচীন ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অধার্মিক শব্দটি এক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। অধার্মিক ব্যক্তি শুধু সমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেন না শাশ্বত এক মহাজাগতিক শৃঙ্খলা (**ঋত**) ভঙ্গ করেন। এর জন্য তাঁকে "**পাপের**" ভাগী হতে হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি যা করেন, সেটা পাপ'ও নয়, অপরাধ'ও নয়। হীন স্বার্থান্বেষণ থেকেই তার জন্ম হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি, দুর্নীতির দুটি পরস্পর - সম্পৃক্ত স্তর রয়েছে। স্তরভেদ অনুযায়ী দুর্নীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic) অথবা সাংগঠনিক (organized) চরিত্রের হতে পারে।

প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সাংগঠনিক ও মিশ্র, তিন প্রকার দুর্নীতিই ছিল। কথাসরিৎসাগরে(৩৮.৪৭) প্রপঞ্চবুদ্ধি নামক জনৈক ধূর্ত ব্রাহ্মণ স্বয়ং রাজাকেই ঘুষ দিয়েছে। মহাভারতের কালকবৃক্ষীয় উপাখ্যানে (সভাপর্ব, ১২০;৭) জনৈক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপনে বিপুল অর্থ গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণকারী ব্যক্তিদের উপধা (লোভনীয় বস্তুতে স্পৃহা) যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, অর্থশাস্ত্র রচয়িতা সে'কথা বিলক্ষণ জানতেন। তাই আমলাদের"উপধা-পরীক্ষা"(অর্থশাস্ত্র ৪,৪) করতে বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি এমন অনেক অর্থগৃধ্নু আচার্য(তীর্থীক)'দের কথা বলেছেন(২.২৪১) যিনি লোভনীয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করতেন। এ'ছাড়া ভুয়া ওজন ব্যবহার (**তুলাবিষম্**), ভেজাল মাল সরবরাহ (**পেটকম্**), ক্রেতা-ঠকান (**পিষ্ক**) প্রভৃতি অবাধে চলত (অথশাস্ত্র ৪,২-৩)। ন্যায়বিচার বিভাগেও এ'সব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ চালু ছিল। বিচারকগণ অনেক সময় ধনী ব্যক্তিদের সপক্ষে রায় দিতে গিয়ে বিচার প্রক্রিয়াকেই প্রহসণে পরিণত করতেন। স্মার্তগণ একে "প্রকাশ্য

তস্করতা"(বৃহস্পতি স্মৃতি) আখ্যা দিয়েছেন। মহাভারতের সভাপর্বে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "হে শুদ্ধসত্ব! তোমার দ্বারা নিযুক্ত বিচারকগণ যে উৎকোচের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে অবিচার করেন না, এটা বোধহয় আশা করতে পারি?" মনুসংহিতার লেখক তাই বিচারককে সতর্ক করে বলেছেন:—

"ধর্ম এব হন্তো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত।

তস্মাৎ ধর্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্মো হতোব্বধোৎ।।"

অর্থাৎ ধর্মকে বধ করলে তা স্বয়ং প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়ায় আবার একে রক্ষা করলেই এ নিজেই রক্ষা করে। অতএব হে বিচারক, কদাচ স্বধর্মকে বিসর্জন দিওনা।

সরাসরি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়, এরকম কিছু দুর্নীতি ছিল, যা আইনের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করত। নারদস্মৃতি তে(৪.১১.১)'নিক্ষেপ' বা উপনিধি'র কথা বলা হয়েছে যার সোজা বাংলা মানে হল 'পরের গচ্ছিত সম্পত্তি নির্লজ্জভাবে গ্রাস করা।' পরদূষণ বা পৈশূণ্য (villification) করে অন্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করা ছিল কতিপয় দুষ্টলোকের পূণ্যব্রত। মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ১৫.৪) এ'ধরণের লোক'কে নৃশংসবাদিন্ বলা হয়েছে।

সাংগঠনিক স্তরে যে'সব দুর্নীতি প্রচলিত ছিল, সেগুলি ছিল আরো সুক্ষ ও সুদূরপ্রসারী। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র এরকম বহু দুর্নীতিকে অঘোষিত রাষ্ট্রনীতিতে পরিণত করেছে। সেখানে রাজাকে সংঘভেদ (দল - ভাঙ্গানো) গূঢ়পুরুষ অভিনিবেশ (গুপ্তচর লাগানো, প্রয়োজনে এরা রাজদ্রোহী ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা করতেন), বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি করতে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত করভার চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কোন অমাত্যকে রাক্ষস বা যক্ষ সাজিয়ে প্রজাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করার ব্যবস্থাও সুপারিশ করা হয়েছে।

আবহমানকাল ধরে দুর্নীতি মানুষের ছায়াসঙ্গী। যেহেতু তার উৎপত্তি মানুষের মধ্যেই, তাই বাইরের জগতে তার সমাধানের সূত্র মিলবে না এবং যতদিন ঐ সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে না, ততদিন আদর্শ দুর্নীতি মুক্ত সমাজ আকাশকুসুম কল্পনাতেই থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১) চন্দ্র, ডঃ প্রতাপচন্দ্র, কৌটিল্য অন্ লাভ্ এন্ড্ মরালস্ কলিকাতা, ১৯৯৫।

২) কাংলে, আর.পি., দ্য কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, তিন খন্ড, বম্বে(মুম্বাই),১৯৬০-৬৫।

৩) অবোয়্যার, জে., ডেইলি লাইফ্ ইন্ এন্শেন্ট্ ইন্ডিয়া, প্যারী (Paris) ১৯৬৯।

৪) দাস, শুক্লা, ক্রাইম্ এন্ড্ পানিশ্মেন্ট্ ইন্ এন্শেন্ট্ ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৭৭।

৫) ঠাকুর, উপেন্দ্র, করাপশান্ ইন্ এন্শেন্ট্ ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯।

৬) ভট্টাচার্য, এইচ্ এন্., দ্য এথিক্যাল্ ফাউন্ডেশন্ অব্ হিন্দু জুরিস্প্রুডেন্স্, কলিকাতা, ১৯৩২।